পূর্ব থেকে পশ্চিম
পর্বঃ ৯

মাধ্যমিক স্কুলে থাকাকালীন সপ্তম শ্রেণীতে একদিনের জন্য তিনি আমাদের একটি ক্লাস নিয়েছিলেন। আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'সে-দিনের সে-কথা মনে আছে কি না?' আমি বললাম, 'মনে আছে।' আরো বললাম, "আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'enemy' শব্দের অর্থ কি?" শুনে কিছুটা অবাকই হলেন তিনি। হয়তো এতোটা আশা করেননি। নিউইয়র্ক শহরে আমার নিজ এলাকার সবাই তাঁকে 'স্যার' বলেই ডাকেন। আমি নিউইয়র্ক যাচ্ছি শুনে আমাকে ফোন করেছেন, ফোন করে আমার ফ্লাইটের সমস্ত কিছু জেনে নিলেন। এবারের ক্রিসমাসটা নিউইয়র্কে কাটাবো বলে আমি এক সপ্তাহ আগে শিকাগো ছেড়ে সেখানেই যাচ্ছি। কারো থেকে তিনি খবরটা জেনেছেন। একদিন পরেই আবার ফোন করে বলেন, তিনি এয়ারপোর্টের ভিতরে একজনকে বলে রেখেছেন, কোন ধরণের সমস্যা হবে না। আর অতি অবশ্যই তিনি আমাকে গিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসবেন। আমি বুঝলাম না, এয়ারপোর্টের ভিতরে একজনকে বলে রাখার কারণে কি এমন সুবিধাটা হবে; না বললেই বা কি এমন অসুবিধাটা হতো। বারবার করে বলছিলেন, 'আমারতো অনেক বয়স হয়ে গেছে, তুমি কি এখন আমাকে চিনতে পারবে?' কিন্তু আমি জানি, আমি চিনতে পারবো। আমি চিনতে পারি, আমি বুঝতেও পারি। আমি বুঝতে পারি, জীবন থেকে জীবন হারিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে। একদা যৌবনের রঙ্গিণ দিন ফেলে ছুটে এসেছিলেন অ্যামেরিকা, সোনার হরিণের খোঁজে। শুধু আপনি নয় স্যার, এমন ভেবেই সবাই আসে। আমি আপনি আমরা সবাই আসি। কিন্তু জানিনা কতজন সেই জিনিসের দেখা পাই। সবার শেষের কবিতা তো একটাই, একটাই গান অবসরের- 'জীবনটাকে শেষ করে দিলাম।' আপনাকে ভুলিনি, একমাইল দূর থেকে দেখলেও চিনতে পারবো। ছোট বেলার শিক্ষক, সে একদিনের হোক আর এক যুগের হোক, তাঁকে ভুলে যাওয়া সম্ভব না। বাংলার কোন ছাত্র তাদের প্রাইমারী আর মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের এক জীবনে ভুলতে পারে না; ভুলে থাকলেও থাকতে পারে কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়ীদের।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়, রাহাত খানকে নিয়ে। খান সাহেব আমি ইউএসএ আসার পরের দিন থেকে ফোন করে বলে যাচ্ছেন, 'যেমন করেই পারো ড্রাইভিংটা শিখে ফেলো। এর মত ভালো জিনিস এখানে আর হতে পারে না।' তিনি নিজেও ড্রাইভ করেন। ফিসফিস করে আবার আমাকে বলেন, 'এখানে ড্রাইভ করলে ভালো পয়সা আয় করা যায়।' ভাবখানা এমন যে, এরকম গোপন একখানা কথা একমাত্র ইহজগতে তিনিই জানেন, আর অতি আপন ভেবে এইমাত্র তিনি চরম গোপন কথাটি আমাকেও জানিয়ে দিলেন। রাহাত খান সাহেব আমার নিজ এলাকায় কিংবদন্তিতুল্য। এলাকার ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই তাকে রাহাত খান বলেই ডাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করেছেন

আবার মাদ্রাসা থেকে টাইটেল পাস করেছেন। কথিত আছে যে, পরীক্ষার আগের শীতের রাতে ঘুম আসবে বলে বিছানায় পানি ঢেলে দিতেন এই রাহাত খান। মেধাবী এবং পরিশ্রমী বলে এলাকায় তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে।

বাংলাদেশে থাকতে সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ছিলেন। কিন্তু সে-গল্প শুরু করেন একটু অন্যভাবে। 'আমি যখন সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলাম'- এই বলে গল্পের শুরু। সোনালী ব্যাংকের 'জিএম'-এ গিয়ে সেই গল্প থামে। দূর থেকে আঙ্গুল দিয়ে দেখান, 'ঐ-যে দেখছো, ওটা হচ্ছে ডিসি'র বাংলো'। তারপরই নিজে নিজেই বলেন, 'হতে চাইনি, হতে চাইনি।' উনার ভাষ্য মতে, উনি ইচ্ছা পোষণ করলে সেটা ছিলো কেবলমাত্র তার বাম হাতের খেলা। নিউইয়র্ক শহরে তাঁকে অনেকে 'মাওলানা' বলেও ডাকেন। এখানে এসে বছরের পর বছর ওয়াজ করে মানুষের ব্যাপক সমীহও আদায় করেছেন। কথিত আছে যে, একবার শেখ হাসিনা নিউইয়র্ক আসলে তিনি ওয়াজ করবার সময় আবেগে আপ্লুত হয়ে বলে ফেলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেহেস্তের বাগানে হাঁটাহাঁটি করছেন।' পরবর্তীতে বীর বাঙ্গালি উনার এহেন মন্তব্যের ব্যাখ্যা দাবী করলে তিনি ব্যাপক বিপদের মধ্যে নিপতিত হন। কিন্তু আমি জানি যারা ওয়াজ করতে শিখে গেছেন, তাদের ব্যাখ্যার অভাব হয়না। অতএব, বিপদ থেকে মুক্তি পেতে উনার সামান্যতম কষ্টও হয়নি।

ছোটবেলায় আমি যে স্কুলে পড়াশোনা করেছি, রাহাত খানও সে-স্কুলেই পড়েছেন। পুরো এলাকায় সেটি নাম করা স্কুল ব'লে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে সেখানে পড়তেন। উনাদের বাড়ি থেকে স্কুল দূরে ছিলো বিধায় এখানে এক স্থানীয় বাড়ীতে লজিং থাকতেন। যে-ছাত্রকে তিনি পড়াতেন, কিছুদিনের মধ্যে সে ছাত্র তার প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠে। প্রিয়পাত্র হবার কারণ আর কিছুই নয়, ছাত্রটি তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান এবং বাবা-মা তাকে আপেল-কমলা-আনার খাইয়ে কোলে পিঠে করে মানুষ করছে। অনেক পরে, খান সাহেব তার প্রিয় ছাত্রটিকে পছন্দ করেছন তার আরেক প্রাণপ্রিয় ভাগনির জন্য। কিন্তু ছাত্রের মাকে রাজী করানো অত সহজ কাজ নয়। এই মহিলার ভয়ে চারপাশের মাটি পর্যন্ত কাঁপে। যদিও একমাত্র ছেলের শিক্ষক হিসেবে ভদ্রমহিলা খান সাহেবকে যথেষ্ট আদর সমাদর করতেন। তাই খান সাহেব মিষ্টি করে হেসে একদিন বলে ফেললেন, 'আমার কাছে খুবই সুন্দরী একটা মেয়ে আছে, দেখলে আপনার পছন্দ হবে, পরিবারের বড় মেয়ে, সবার আদরের।' অতএব, ছেলের যোগ্যতা হলো ছেলে আপেল-কমলা খেয়ে বড় হয়েছে, আর মেয়ের যোগ্যতা হলো মেয়ে সমস্ত পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে আদরের। এই যোগ্যতা বলে, অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনার পর খান সাহেবের সেই ছাত্রের সাথে তারই আদরের ভাগনির বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলো। খান সাহেবের এই প্রিয় ভাগনি আমার মা। খান সাহেব আমার মায়ের আপন মামা। তার সেই প্রিয় ছাত্র আমার বাবা।

সমস্যা হচ্ছে খান সাহেব এখন পণ করে বসে আছেন আমাকে গাড়ী ড্রাইভ করা শেখাবেন। সাধারণত তাঁর উপর দিয়ে আমার নিজের ফ্যামিলির বা তার ফ্যামিলির কেউ কথা বলে না। কারণ

আর কিছুই না। চ্যাঁচাম্যাচি করে আকাশ-বাতাস ভারী করে ফেলবেন। ক্লাস ফাইভে থাকতে আমাকে জিজ্ঞেস করতো, 'এই বল ন্যাটোর সদর দপ্তর কোথায়?' আমি বলতাম, 'ন্যাটো কি?' তিনি চোখমুখ গরম করে বলতেন, 'একটা ছেলেও স্মার্ট হলো না।' এরপর তিনি যতবারই ইউএসএ থেকে বাংলাদেশে গিয়েছেন, আমার আর সমস্যা হয় নি। কারণ কেউ স্মার্ট কি না সেটা যাচাই করার জন্য তিনি ওই একটা প্রশ্নই জানতেন, সেটাই প্রতিবার জিজ্ঞেস করতেন। এই বিখ্যাত স্মার্ট মাওলানা রাহাত খান, যিনি বাংলাদেশে আসলে রাতের বেলায়ও সানগ্লাস পরে থাকেন, তিনিও আসবেন আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিতে। এই দু'জনের আসার খবর জেনে আমার নিজের বন্ধুরা তাদের বন্ধুত্বের পরিচয় দেবার একমাত্র সুযোগটি হাতছাড়া করবার বেদনায় যারপরনাই অস্বস্তি প্রকাশ করতে থাকল। তাদের সেই সমস্যার সমাধান না হলেও, অন্য সমাধান হলো রাহাত খান সাহেব এয়ারপোর্ট যাবার আগে স্যারকে বাসা থেকে নিয়ে দু'জন একসাথে আসবেন।

'নিউইয়র্ক'। 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' কিংবা 'রকেফেলার সেন্টার' দেখবার আগ্রহ আমার নেই। আমার আগ্রহ ইতিহাসে। পুরোনোতে ফিরে যাওয়াতে। কাতারের রাজধানী দোহাতে আমি নেমেছিলাম, আমার পূর্বপুরুষের পদচিহ্নে আমার পদচিহ্ন রাখবার জন্য। আমার বাবা যেখানে হেঁটেছে সেখানে আমি হেঁটেছি, কি এক অদ্ভুত অনুভূতি যেন আমাকে মগ্ন করে ফেলেছিলো তখন। যৌবনের রঙ্গিণ দিন ফেলে আমার নিজের বাবাও একদিন এসেছিলেন এই নিউইয়র্কে, আমি তার পদচিহ্নের উপর আমার পদচিহ্ন রাখতে এসেছি। রাহাত খান আমার বাবা মায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন আজ থেকে কয়েক দশক আগে। আমি জানি না, আমার বাবা-মা কতটা সুখী হতে পেরেছে। মাঝে মাঝে মাঝ-রাতে আমার মায়ের জোর গলার আওয়াজ শুনে আমাদের ভাইবোনদের ঘুম ভেঙ্গে যেত। আমার নিউইয়র্ক ফেরত বাবা কালেভদ্রে হয়তো সেদিন ড্রিংক করে বাড়ী ফিরেছেন। আমার মায়ের জন্য এটা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। আজ আমি জানি, এটা হয়তো তেমন কিছুই নয়; কিন্তু সে-সময় বাবার উপর প্রচন্ড মন খারাপ হতো। যখন অনেক বড় হয়েছি তখন মাঝে মাঝে আমার মা আমাকে অভিযোগের সুরে বাবার নামে কিছু কথা বলেন। আমি ভাবতাম, মা কি চাচ্ছেন আমি বাবাকে কঠিন কিছু কথা বলি। আমি ব্যাক্তিগতভাবে কখনো কাউকে কিছু বলতে পছন্দ করি না। ছোট্ট একটা জীবন, যার যেভাবে খুশি চলুক না। তারপর মায়ের কথা শুনে, মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলতাম, 'আচ্ছা আমি উনাকে বলছি।' তারপর মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'থাক কিছু বলার দরকার নেই, মন খারাপ করবে।' আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, ভালোবাসা যে কাকে বলে। মানুষ অনেক সময় ভালোবেসেও বুঝতে পারে না যে সে ভালোবাসে। বাবার সমস্ত ব্যাপারে মা সবসময় দোষ দিত নিরপরাধী 'নিউইয়র্ক' শহরকে। মা মনে করতেন বাবার যা-কিছু একটু-আধটু দোষ-ক্রুটি আছে তার কারণ ওই নিউইয়র্ক। আমার বাবার ফিরে আসবার চব্বিশ বছর পর আজ আমি আবার সেই শহরের পথে।

শিকাগোর মিডওয়ে এয়ারপোর্টে বসে বসে আমি যখন এই-লেখা লিখছি, সবকিছু ঠিক থাকলে আর চারঘন্টার মধ্যেই আমার মায়ের অপবাদ দেয়া সেই অপরাধী নিউইয়র্ক শহরে আমি পৌঁছে যাবো।

চুপি চুপি সবাইকে না জানিয়ে একদিন বের হয়ে যাবো। চলে যাবো সেই জায়গায়, যেখানে একদিন আমার বাবা থাকতেন। চারপাশটা দেখে নেব।ভালো করে।হেঁটে বেড়াবো। তারপর সময়কে ডেকে বলবো, দেখো সময়, তুমি হয়তো চলে যাও, কিন্তু প্রজন্ম ঠিকই থেকে যায়। দেখ আমি এসেছি, অস্তিত্বের কথা বলতে এসেছি, আমার পূর্বপূরুষের কথা বলতে এসেছি। ইতিহাস; হ্যাঁ, আবারো বলছি, ইতিহাস যে কথা বলে। (চলবে...)

পরশপাথর
Poroshpathor81@yahoo.com
ডিসেম্বার ২০, ২০০৯
মিডওয়ে এয়ারপোর্ট, শিকাগো।